বাংলাদেশের মতো একটি অনগ্রসর, কৃষিপ্রধান দেশে কমপিউটার প্রযুক্তি আসার পঞ্চাশ বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বছর সেই সময়টি আমরা পার করছি। বছরটি উদযাপন করার জন্য এর আগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলেছি। এই বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমদ পলককে এই বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছি। এই বিভাগের সচিব নজরুল ইসলাম খানকেও একই প্রস্তাব দিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে আমি বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি ও বেসিসের সাথেও কথা বলেছি। তাদেরকেও একটি জাতীয় পর্যায়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি গঠন করে এর মাধ্যমে ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করার প্রস্তাব করেছি। ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর কাছেও বিষয়টি তুলে ধরেছি। তবে এখন পর্যন্ত কোনো মহল থেকেই আমাদের এই সুবর্ণ সময়টিকে স্মরণ করার কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

আমাদের গর্বের বিষয়, বাংলাদেশে কমপিউটার আসার পঞ্চাশ বছর পুরো হচ্ছে এই ২০১৪ সালে। সঠিক তারিখটা জানি না বলে এরই মাঝে ৫০ বছর পুরো হয়ে গেছে কি না বা কোনদিন সেটি পূর্ণ হবে, সেটিও বলতে পারব না। পরমাণু শক্তি কমিশনসহ অনেকের সাথে বারবার যোগাযোগ করেও এখনও জানতে পারিনি, পরমাণু শক্তি কমিশন কোন তারিখে সেই কমপিউটারটি স্থাপন করেছিল। তবে ১৯৬৪ সালে পরমাণু শক্তি কমিশনে একটি আইবিএম ১৬২০ যে স্থাপিত হয়েছিল, সেই বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ নেই। এই কমপিউটারের ব্যবহারকারী মো: হানিফউদ্দিন মিয়ার সাথে কথা বলে তা নিশ্চিত করেছি। খুব সঙ্গতকারণেই বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটার স্থাপনের পর পার হয়ে যাওয়া এই পঞ্চাশ বছরে কেমন ছিল এই দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি– পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এসব বিষয় পর্যালোচনা করা যেতেই পারে।

সময়টা এতটা বিশাল বলে এর মূল্যায়নের পরিধিটাও অনেক বড় হতে পারে। সেই সুযোগটি এখানে নেই বলে খুব সংক্ষেপে আমরা একটু পেছনে তাকিয়ে বড় বড় মাইলফলকগুলো দেখতে পারি। আমার নিজের বিশ্লেষণে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির এখন পর্যন্ত তিনটি অধ্যায় রয়েছে।

ক. প্রথম অধ্যায়টি ১৯৬৪ থেকে ১৯৮৭ সালের। এটি আমাদের আদি ও প্রাথমিক যুগ। খ. দ্বিতীয় অধ্যায়টি ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ সময়কালের। এটি ডেস্কটপ প্রকাশনা ও বাংলাভাষার বিপ্লবের যুগ। গ. আর পরের অধ্যায়টি এরপর থেকে এখনকার। এটি আমাদের সুবর্ণ সময়।

তবে এর মাঝেও সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিভাজন রেখা আছে। যেমন, ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ সময়কালের মাঝে ১৯৯১ পর্যন্ত সরকারের ভূমিকা একরকম ছিল, আর ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সময়কালে সরকারের ভূমিকা আরেক রকম ছিল। এমনি করে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সময়কালের সাথে ২০০১ থেকে ২০০৮ সময়কালের কোনো তুলনা করা যাবে না। অন্যদিকে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সময়কালটি বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের মধ্যগগনের সময়কাল। সামনের দিনগুলো হয়তো হবে আরও ভিন্নমাত্রার। তবে সায়াহ্নকাল যদি না আসে, তবেই আমরা খুশি হব। যদিও সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টার কোনো রকমফের হয়নি, তথাপি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই ফলাফলটি ভিন্নরকম হয়েছে। যা-ই হোক, ৫০ বছরের সর্বশেষ ফলাফলে অসন্তুষ্টির কোনো কারণ দেখি না। যদিও প্রত্যাশা আরও বেশি হতে পারে, তথাপি অর্জনটা মোটেই কম নয়। মাঝেমধ্যে খরগোশের মতো ঘুমিয়ে থেকে আবার আমরা দ্রুতগতিতে দৌড়েছি।

৬৪-৮৭ ॥ আদি ও প্রাথমিক যুগ : বাংলাদেশে কমপিউটার আসার পর থেকে শুরু করে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত যে সময়টি ছিল, তাতে

cÂvk eQ‡ii

কমপিউটার প্রযুক্তির সাথে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো সম্পর্কই ছিল না। যারা কমপিউটারে প্রোগ্রাম লিখতে পারতেন, তারাই কমপিউটার স্পর্শ করতেন। একেবারে শুরুতে কমপিউটারের প্রসারও খুব সীমিত ছিল। আদমজী জুট মিলের মতো বড় প্রতিষ্ঠান, ইউনাইটেড বা হাবিব ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট ইত্যাদি বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার বসতে থাকে। কমপিউটারের কাজও ছিল সীমিত। প্রধানত গণনার কাজ করাই ছিল একমাত্র কাজ।

তবে এটি উল্লেখ করা উচিত, ১৯৭৬ সালের আগে দুনিয়াতে ছোট কমপিউটার তো ছিলই না। ফলে সারা দুনিয়ার চিত্রটাই এমন ছিল, বিশেষত গণনা কাজের জন্য কমপিউটার ব্যবহার হতো এবং শুধু প্রোগ্রামাররাই এসব যন্ত্র পরিচালনা করতেন। তবে ১৯৭৬ সালের পর দুনিয়াতে পিসির আবির্ভাব ঘটলেও তার প্রভাব বাংলাদেশে পড়েনি। অ্যাপল সিরিজের কমপিউটারগুলো এ দেশের সাধারণ মানুষের হাতে যায়নি। শুধু ঢাকার আমেরিকান স্কুলে ব্যবহার হতো এগুলো। এমনকি ১৯৮১ সালে আইবিএম পিসি বাজারে আসার পরও এ দেশে পিসির ব্যবহার মোটেই বাড়েনি। কিছু কিছু লোক ওয়ার্ডস্টার, লোটাস আর ডিবেজ ব্যবহার করতেন বটে। তবে একে কোনোভাবেই জীবনের মূলস্রোতের সাথে যুক্ত বলে ধরা যেত না।

ফলে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ কমপিউটার যন্ত্রটির ব্যবহারের সাথে যুক্ত হয়। এই সময়টাকে আমরা আদি বা প্রাথমিক যুগ হিসেবে সূচনা পর্বও বলতে পারি। এমনকি সেই সময়ে যারা বড় কমপিউটারের বদলে পিসি ব্যবহার করতেন, তারাও সংখ্যায় এত কম ছিলেন যে সমাজে, রাষ্ট্রে বা অন্য কোনো স্তরে তার কোনো প্রভাব ছিল না। এই সময়ে সরকারের কোনো নীতিমালাই তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের জন্য সহায়ক ছিল না। কেউ ভাবেনি যে তথ্যপ্রযুক্তি নামের কোনো বিষয়ে সরকারের কিছু করার আছে। অথচ ভারত ১৯৮৬ সালে তাদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলে। বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রে এত আগে কমপিউটার আসার পরও নীতিনির্ধারক, আমলা ও রাজনীতিকদের অক্ষমতায় পিছিয়ে পড়েছি। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা নানা কারণে তাদের পূর্বপুরুষদের দৈন্যদশার জন্য নিজেরা লজ্জিত হবে।

৮৭-৯৬ ॥ ডেস্কটপ প্রকাশনা ও বাংলাভাষার পিসি বিপ্লব : শুরুটা একেবারেই সাদামাটাভাবে হয়েছিল। ১৯৮৭ সালের ১৬ মে কমপিউটারে কম্পোজ করা একটি বাংলা পত্রিকা, যার নাম আনন্দপত্র, সেটি প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটি বিপ্লবের সূচনা হয়। যদিও ১৯৮৬ সালে বা তারও আগে কমপিউটারে বাংলার জন্ম হয় এবং ১৯৮৬ সালেই ডেস্কটপ পাবলিশিং প্রযুক্তিতে ঢাকা কুরিয়ার নামের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তবুও আনন্দপত্র ডিটিপি বিপ্লবের আগুনের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে। এটি বস্তুত কমপিউটারে বাংলা ব্যবহার করতে পারার জন্যই সম্ভব হয়েছে। তারচেয়েও বড় ঘটনা ঘটে ১৯৮৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর। সেই দিন বিজয় বাংলা কীবোর্ড ও সফটওয়্যার প্রকাশিত হয় এবং এরপর বাংলাদেশের কমপিউটার প্রযুক্তি আর কখনও পেছনে ফিরে তাকায়নি। এই বিপ্লবের যে কটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তার মাঝে প্রধানটি হচ্ছে– সাধারণ মানুষের হাতে কমপিউটার পৌঁছানো, সহজে কমপিউটার ব্যবহার করতে পারা, বাংলাভাষায় কমপিউটার চর্চা করতে পারা, সৃজনশীল কাজে কমপিউটারকে ব্যবহার করতে পারা এবং শিক্ষায় কমপিউটার ব্যবহার করতে পারা। স্টিভ জবসের অ্যাপল কমপিউটার শুধু বাংলাদেশেই এই বিপ্লবটি করেনি, কার্যত দুনিয়ার সর্বত্র এই বিপ্লবের সূচনা হয় মেকিন্টোস কমপিউটারের হাত ধরে। আমাকে যদি বাংলাদেশে কমপিউটার চর্চার সময়টিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে বলা হয়, তবে ১৯৮৭ সালকেই আমি এর সূচনালগ্ন বলে চিহ্নিত করব। এর আগের সময়টি কার্যত ছিল কমপিউটার নিয়ে কিছু লোকের নড়াচড়া করার সময়। এই সময়ে কমপিউটার তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছায়। বাংলাভাষায় কমপিউটার বিষয়ক বইপত্র, পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হতে থাকে এবং গণমাধ্যমের মূল স্রোতে কমপিউটার প্রযুক্তি তার আসন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ১৯৮৯ সালে ঢাকার আমেরিকান স্কুলে প্রথম কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেই সময়েই চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ হোটেলে আয়োজিত হয় বাংলাদেশ কমপিউটার ক্লাবের কমপিউটার মেলা। ১৯৮৭ সালে জন্ম নেয় বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি, যেটি ১৯৯২ সালে সরকারের কাছে নিবন্ধিত হয়। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি ঢাকায় আয়োজন করে কমপিউটার মেলা। এই ▸

ডিজিটাল বাংলাদেশ ॥ একুশ শতকের সোনার বাংলা : বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের তথ্যপ্রযুক্তি যাত্রার সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় হচ্ছে ২০০৯ সালের পরের সময়টি। যদিও ২০১৩ সালে একটি সরকারের মেয়াদ শেষ হয়েছে, তথাপি একই সরকারের ধারাবাহিকতা বহাল থাকায় ২০০৯ সালের কর্মসূচিগুলো এখনও অব্যাহতভাবেই চলছে। আমি এই ধারণা পোষণ করতে পারি, এই সরকার দেশ পরিচালনা করলে তাদের কর্মসূচিও অব্যাহত থাকবে। এবার ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ অবশ্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেছে।

২০০৭ সালে আমরা প্রথমবারের মতো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করি। ২০০৮ সালেও আমরা একই বক্তব্য প্রকাশ করি। সেই বছরের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দলের ইশতেহার প্রকাশ করেন। তিনি তাতে ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সেই নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর শেখ হাসিনার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়। ২০০৯ সালের শুরুতেই গ্রহণ করা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা। এরপর গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার অনেকগুলো মাইলফলক কাজ করেছে।

০১. 'জনগণের দোরগোড়ায় সেবা' স্লোগানটি অনেক পুরনো হলেও এবারই প্রথম ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করে সেখান থেকে গ্রামের মানুষকে সরকারি সেবা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
০২. জেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসসহ উপজেলা স্তরের অফিসগুলোর ডিজিটাল রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে। জেলায় ডিজিটাল পদ্ধতির সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
০৩. এই সময়ে মাত্র ১২ লাখ ইন্টারনেট গ্রাহক প্রায় ৪ কোটিতে উঠেছে। মোবাইলের সাড়ে ৪ কোটি গ্রাহক ১১ কোটি ছাড়িয়েছে। এসেছে থ্রিজি। জেলা শহরগুলো চলে এসেছে থ্রিজির আওতায়। ব্যান্ডউইডথের দাম কমে হয়েছে ২৮০০ টাকা।
০৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গড়ে উঠেছে কমপিউটার ল্যাব ও ডিজিটাল ক্লাসরুম। তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল কনটেন্ট। প্রশিক্ষিত হচ্ছে শিক্ষকেরা।
০৫. সফটওয়্যার ও সেবা খাতে রফতানি বেড়েছে। প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলারের রফতানিকে ১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। অন্তত ৩০ হাজার দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার কর্মসূচি হাতে নিয়ে সফটওয়্যার পার্ক, হাইটেক পার্ক ও ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
০৬. মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি মোবাইলভিত্তিক সেবার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ২০১৪ সালের এপ্রিলে দিনে ২৫০ কোটি টাকার লেনদেন শুধু মোবাইল ফোনেও হয়েছে।
০৭. ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি মন্ত্রণালয় নামে ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামের দুটি মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে এই খাতের গুরুত্বকে অনুধাবন করে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। আইসিটি ডিভিশন নামে একটি নতুন ডিভিশন চালু করা হয়েছে।

তবে এই সময়ে আমরা আরও কিছু বড় উদ্যোগ আশা করেছিলাম। সবচেয়ে বড় যে উদ্যোগটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম সেটি হচ্ছে ডিজিটাল সরকার। আমরা একটি কাগজবিহীন সরকারের কথা ভেবেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ যদি গড়তে হয়, তবে সরকারকে কাগজবিহীন হতে হবে এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেখ হাসিনা সরকারের ২০০৯-১৩ সময়কালে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার বড় কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। সরকারের কাজ করার পদ্ধতির পরিবর্তনের জায়গাটি জেলা পর্যায়ের ওপরে ওঠেনি। ফলে যে কাঙ্ক্ষিত ডিজিটাল রূপান্তর আমরা সরকারের সব অঙ্গে দেখতে পেতে পারতাম, সেটি দেখিনি। অন্যদিকে বেসরকারি খাতের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের কৌশলে তেমন কোনো নতুনত্ব না আসায় এই খাত থেকে যে ধরনের আর্থিক সফলতা আসার কথা এবং যতটা দ্রুত এই খাতের প্রসার ঘটার কথা তা ঘটেনি। আমরা লক্ষ করেছি আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রতি এই শিল্প খাতের নজর ছিল না। একই সাথে আমরা লক্ষ করেছি, মেধাসম্পদ সুরক্ষার বিষয়টিও উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। একদিকে আমরা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা বলছি, অন্যদিকে জ্ঞান সুরক্ষার কোনো আয়োজন করছি না। সরকার ও বেসরকারি উভয় খাতের জন্যই এটি এক ধরনের অবজ্ঞা ও ভুল রণনীতি বলে আমি মনে করি।

যাই হোক, ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ যেভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সামনে যাচ্ছে, তাতে আমরা এই কথাটি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সামনের দিনে আমরা এই অঞ্চলের আইসিটি খাতের নেতৃত্ব দেব।

সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের একটি বড় ঘটনা ঘটে যায় ডেস্কটপ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। তখন একটি দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে। আমরা আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলমান সাবমেরিন ক্যাবল লাইনে যোগ দিইনি। আমাদের তখনকার নীতিনির্ধারকরা মনে করেছিলেন, এর ফলে দেশের সব তথ্য পাচার হয়ে যাবে এবং দেশটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তখনকার বাংলাদেশের সরকার ১৯৯২ সালে একটি চরম ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময়ে আমাদের বঙ্গোপসাগর দিয়ে সি-মিউ-উই-৩ নামের সাবমেরিন ক্যাবল লাইন স্থাপিত হয়। তখন বাংলাদেশকে সেই সংযোগ নেয়ার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু বিনামূল্যে সেই সংযোগ আমরা নেয়নি। এর ফলে বাংলাদেশকে একটি দ্রুতগতির সংযোগ পাওয়ার জন্য ২০০৬ সালের মে মাস অবধি অপেক্ষা করতে হয়। এটি বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দারুণভাবে পেছনে ফেলে দেয়। অন্যদিকে দুনিয়াতে ইন্টারনেটের আগমন, উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের প্রসার এবং দ্রুতগতির প্রসেসরের জন্য তথ্যপ্রযুক্তিতে এক নতুন দিগন্ত প্রসারিত হয়।

৯৬-০৮ ॥ সুবর্ণ যুগের উষালগ্ন : সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের সুবর্ণ সময়টির সূচনা হয় ১৯৯৬ সালের ২৩ জুনের পর। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ প্রথম অনলাইন ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করে। এরপর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ মোবাইলের মনোপলি ভাঙে। ১৯৯৬ সালেই দাবি ওঠে শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত কমপিউটারের। ১৯৯৮ সালে সরকার কমপিউটারের ওপর থেকে সব ধরনের শুল্ক ও ভ্যাট তুলে নেয়। একই সময়ে সরকার জেআরসি কমিটির ৪৫টি সুপারিশ গ্রহণ করে সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। সেই সুপারিশের অংশ হিসেবে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে সরকার, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি ও রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সেমিনারের আয়োজন করে, যেখান থেকে বাংলাদেশ সফটওয়্যার ও সেবা খাত রফতানির এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৭ সালে জন্ম নেয় বেসিস। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ২০০১ সালে বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদল হওয়ার পর তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি সরকারের মনোযোগে ভাটা

পড়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শব্দটি যোগ করা, ২০০৩ সালের জেনেভায় তথ্যসমাজ সম্মেলনে যোগদান এবং ২০০৬ সালে সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়া ছাড়া সেই সময়কার সরকার শুধু শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত কমপিউটারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। এই পাঁচ বছরেও যদি ১৯৯৬-০১ সালের মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্ব পেত, তবে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির অভিযাত্রা আরও মসৃণ হতে পারত। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তুলনামূলকভাবে এর আগের সরকারের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিলেও বিষয়টিতে তাদের সর্বোচ্চ নজর ছিল না। এই সরকারের আমলের সবচেয়ে বড় কাজের একটি হচ্ছে ছবিসহ ডিজিটাল ভোটার তালিকা প্রণয়ন। এই সরকার একটি আইসিটি নীতিমালার খসড়াও তৈরি করে। এই